



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 230 - 236

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

গিরিবালা দেবীর দৃষ্টিতে সমাজ ও পরিবার : প্রসঙ্গ ‘রায়বাড়ী’

সঞ্চিতা দাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: dassanchita154@gmail.com



Received Date 28. 09. 2025

Selection Date 15. 10. 2025

Keyword

19th century,
Bengal,
Andarmahal,
contemporary
society,
tradition,
familial
framework,
Zamindar.

Abstract

In the transitional phase of women's awakening in Bengal, Giribala Devi was one of the important figures to emerge. In the last part of the 19th Century, she was born into a rural village of undivided Bengal. As per the contemporary village tradition, she was married at the young age of only 12. Interestingly, she became educated coming in contact with an educated husband and her affinity towards literature began to grow. The realities of contemporary village life - the household, the family, and society - are reflected in all her literary creations. In most of her stories and novels, we see the struggle of a woman in order to establish herself as an individual, which in a way also represents the broader picture of the contemporary society. In this essay, I have attempted to depict the social and familial framework of the 19th century as reflected in the memory-based writings of Giribala Devi. Written in two parts, Raybadi (1st part 1974, 2nd 1364), stands as a living testimony of the life of a Zamindar family from Bangladesh, covering festivals from Durga Puja to Dol Yatra (Festival of Colours) in detail. Since the author expresses her own life stories in the novel, in the process, she has also revealed events and emotions surrounding a woman's life with precise details. The presence of three generations of people has further helped the readers to understand the contemporary society even better. With the transition from one generation to the other, the changes in societal atmosphere, have also been portrayed vividly in the novel. Under the strict guise of rules and regulations of a 19th century zamindar family, the internal space of the inner household (Andarmahal) also comes into view through her writings, making them even more significant. Without her careful effort, the picture of contemporary society and its characters might have disappeared into oblivion. The essence of a traditional Bengali joint family framework, once used to be the hallmark of Bengali identity and culture under the British rule, had already begun to collapse by then. Giribala Devi has drawn an accurate picture of that transformation in this novel. In this essay, I have attempted to reflect on the joint family framework of that time and in doing so, we tried to delve deeper into contemporary societal realities of the late 19th century.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে মেয়েদের লেখালেখির সূচনা বহুপ্রাচীন না হলেও কম প্রাচীন নয়। মধ্যযুগে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যচর্চার যে ধারার সূত্রপাত ঘটে পরবর্তীতেও তা ক্রমশ বিকশিত হয়। বিশেষত উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলে বাংলা সাহিত্য জগতে আবির্ভাব ঘটে বহু মহিলা সাহিত্যিকগণের। পুরুষ সাহিত্যিকদের পাশাপাশি মহিলা লেখকগণ তাঁদের লেখনীর জাদুবলে বাংলা সাহিত্যে পাকাপাকি স্থান অর্জন করেন। উনিশ শতকে মহিলা লেখকদের রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী ঘটনা। যেকোন সাহিত্য রচনার পশ্চাতে সর্বদাই সমকালীন সামাজিক পরিস্থিতি ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পুরুষের তুলনায় মহিলা লেখকগণের রচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটটি অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অন্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে নারী অন্তঃপুর ও পাশাপাশি বহির্জগতকে ঠিক যেমনভাবে দেখেছেন, যতটুকু দেখেছেন এবং জেনেছেন ততটুকুই বর্ণনা করেছেন। পুরুষের যুক্তি, বুদ্ধি ও মননদীপ্ত ভাবনার পাশাপাশি মেয়েদের রচনায় অধিক প্রশয় পেয়েছে সহজ সরল আবেগ।

“মেয়েদের লেখার একটা নিজস্ব ধরন আছে যা পুরুষের থেকে তার অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে চিহ্নিত করতে অনেক সময়েই বিশেষ কার্যকর হয়ে পড়ে।”^১

অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র গভির মধ্যে আবদ্ধ থেকেও যে সকল মহিলা সাহিত্যিকগণ তাদের স্বল্প পরিসরে দেখা জগত ও জীবনকে সাহিত্যে পরিস্ফুট করেছেন তাদের মধ্যে গিরিবালা দেবী ছিলেন অন্যতম। তিনি পাবনা জেলার হরিনাথপুর গ্রামে মাতামহের গৃহে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ৩১শে আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাতা থাকতেন পাবনা জেলার নাকালিয়া বন্দরের নিকটবর্তী পেচাকোলা গ্রামে। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী মাত্র বারো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় নিকটবর্তী গ্রামের জমিদার উমেশচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্র রায়ের সাথে। তাঁর স্বামী পূর্ণচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত একজন ব্যক্তি এবং তাঁর চেষ্টাতেই গিরিবালা দেবীও শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রথাগতভাবে শিক্ষিত না হলেও স্বামীর সাহায্যে এবং সর্বোপরি নিজের চেষ্টায় তিনি পড়াশোনা শিখেছেন এবং সাহিত্য জগতে ধীরে ধীরে পদার্পণ করেছেন। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি চলেছিল তাঁর নিরন্তর সাহিত্য চর্চা। আবেগপ্রবন কল্পনা জগতকে ঘিরে সাহিত্য সৃষ্টি কেমন ভাবে তিনি শুরু করেছিলেন সে কথা নিজেই জানিয়েছেন –

“বাল্যকাল থেকে আমি কিছু না কিছু লিখবার চেষ্টা করতাম। সে চেষ্টা অকিঞ্চিৎকর। শ্বশুরালয়ে মাতীর উনুনে দুধ জ্বাল দিতে বসে উনুনের পাড়ে কাঠকয়লা দিয়ে গোপনে কবিতা লিখতাম। সেগুলিকে আমি কবিতা বলব না, ছড়া বলব।”^২

সংসারের গভির মধ্যে থেকে হাজার বাধা বিপত্তিকে অতিক্রম করেও সাহিত্যচর্চা যে করা সম্ভব তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গিরিবালা দেবী। প্রাথমিক সাহিত্য অনুশীলনের পরে মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তাঁর প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ। তিনি লিখেছেন বহু গল্প, কবিতা ও উপন্যাস।

সাহিত্য সমাজে গিরিবালা দেবীর অধিক জনপ্রিয়তা ‘রায়বাড়ী’ উপন্যাসের লেখিকা রূপে। এই উপন্যাস লেখিকার স্মৃতিকথামূলক উপন্যাস। উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা নারী শিক্ষার দ্বার উদঘাটন হলে, শিক্ষার সংস্পর্শে সেই সময় অন্তঃপুরে ও সংসারে অবরোধের আড়ালে থেকেও নিজের আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা লেখার মধ্য দিয়েও একদল লেখিকার আবির্ভাব হয়। এই স্মৃতিকথা বা আত্মজীবনীর মাধ্যমে মেয়েরা নিজেদেরকে চেনাতে গিয়ে সমাজকে আরো বেশি করে চিনিয়েছেন। গিরিবালা দেবীর দুই খণ্ডে বিভক্ত ‘রায়বাড়ী’ উপন্যাসটি কেবল তাঁর স্মৃতিকথামূলক উপন্যাস নয়, এ উপন্যাসকে সমকালীন সমাজের দলিল বলা যায়। ‘রায়বাড়ী’ উপন্যাসের নায়িকা বিনু আসলে গিরিবালা দেবী স্বয়ং এবং নায়ক প্রসাদ হলেন তাঁর স্বামী পূর্ণচন্দ্র রায়। রায়বাড়ী উত্তর-পূর্ববঙ্গের এক জমিদার বাড়ি। বিশাল তার আয়তন বিপুল তার আভিজাত্যের মর্যাদা, বিচিত্র তার মানুষজন। তিন প্রজন্মের মানুষ একত্রে সহবস্থান করেন সেখানে। একদিকে দেখা যায় বাকপটিয়সী ঠাকুমা শিবসুন্দরী, আর একদিকে আছেন অতিশয় আচার পরায়ণা সংসার সম্পৃক্ত মনোরমা, আর আছে অমনোযোগী সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা বধূ বিনু। পাশাপাশি রয়েছে সংস্কার সর্বস্ব সরস্বতী ও চঞ্চল বালিকা তরু। স্বল্প

পরিসরে রয়েছে ছোট ঠাকুমা চরিত্রটি। এদেরই মাঝে মাঝে রয়েছে মহেশ, প্রসাদ, ক্ষিতি। এ উপন্যাসে পুরুষের ভূমিকা প্রত্যক্ষ বা প্রধান নয়। আগাগোড়া রয়েছে মেয়েলি জগতের সংস্কারবদ্ধ জীবনের কথা। এই উপন্যাস দাস-দাসী, আত্মীয় অনাত্মীয় এবং অতিথি কুটুম্ব দ্বারা পরিবৃত্ত হয়ে একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার ঠিক কিভাবে পরিচালিত হয় তার নির্ভরযোগ্য দলিল বলা যায়।

‘রায়বাড়ী’ উপন্যাসটির সূচনাতেই রয়েছে দুর্গোৎসবের কথা এবং তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে গ্রামীণ সংস্কৃতি, নানান উপাচার ও আচার অনুষ্ঠান। উৎসবকে ঘিরে প্রতিটি মানুষের ব্যস্ততা ও অপরিসীম পরিশ্রমের বর্ণনা রয়েছে। পূজোর আচার অনুষ্ঠানের বর্ণনার সাথে অন্তঃপুরে নারীদের জীবন এবং তাদের সংসার কর্মপদ্ধতির একটা বিবরণ পাওয়া যায়। উপন্যাসের সূচনাতেই লেখিকা জানিয়েছেন –

“পূজা আসন্ন। রায়বাড়ীতে কোলাহল ও ব্যস্ততার সীমা সংখ্যা নাই। পল্লীগ্রামে পূর্ব হইতে উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিতে হয়। গ্রামের পূজার উপাদান উপকরণ চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, মোয়া, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের তক্তা, মুক্তাবশীর নাড়ু, নারিকেলের চিড়া- জিরা, শিউলি ফুল ইত্যাদি। পূজার জলপানি যাহা কিছু অত্যন্ত শুদ্ধাচারে বাড়ির মেয়েদেরই করিবার নিয়ম। কাজেই মাসাধিকাল পর্যন্ত অন্তঃপুরিকাদের বিরাম-বিশ্রাম নামক পদার্থের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে না।”^৩

রায়বাড়ীতে দাসদাসী ও পাচকের ছিল না কোন অভাব কিন্তু পূজোর প্রস্তুতিতে বাড়ির মানুষ ব্যতীত ছিল না কারোর অধিকার। অনাচারের ভয়ে অন্তঃপুরিকাগন থাকত সদা ভীত সন্ত্রস্ত। এই অনাচারের ভয়ে সকলকে নানান পরামর্শ দিতে থাকে রায়বাড়ির পুরনো গৃহকর্ত্রী শিবসুন্দরী। কিন্তু কালের নিয়মে একদিন যে সব ক্ষমতাই হয় নিশ্চিহ্ন তার প্রতিভূ শিবসুন্দরী চরিত্রটি। পঁচাত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধা সর্বদা ঘুরে বেড়িয়ে খোঁজ নিতেন কোন কাজ কতদূর এগিয়েছে কিন্তু তার সংসারে সেই হয়েছে অনাদৃতা, উপেক্ষিতা ও মূল্যহীনা। সনাতন বিধি মেনে বিধবা হওয়ার কারণে তিনি ছিলেন একাহারী। দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে বাড়ির সকল অন্তঃপুরিকাগন যখন নানান দায়িত্বে সামিল তখন ঠাকুমাও ব্যস্ত হয়েছে। দাস-দাসীদের নানান পরামর্শ দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সেই পরামর্শ গ্রাহ্য হয়নি। যেহেতু তিনি নিজের পরিধানের কাপড় সামলে উঠতে পারতেন না তাই ঠাকুরের মন্ডপে তার স্থান হয়েছে সিঁড়িতে। তাকে খানিকটা অস্পৃশ্য করেই রাখা হয়েছে। অর্থাৎ সংসারে কর্ত্রীর বদল ঘটেছে তাই পুরনো কর্ত্রীর প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। ঠাকুমা চরিত্রটি আসলে উনিশ শতকের নারী জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার ভাবনা-চিন্তা, আচার-আচরণ এমনকি ভাষা প্রয়োগ দ্বারা সমকালীন প্রেক্ষাপট ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে খানিকটা অবগত হওয়া যায়। সমকালীন নারী চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করা যায়। উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ নারী ছিলেন শিক্ষার সংস্পর্শবিহীন তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিলেন অন্ধকুসংস্কারহীন। তাই ঠাকুমা অন্তঃসত্ত্বা নাতনিকে বলেছেন –

“তোকে না পই পই করে বারণ করে দিয়েছি, সন্ধ্যার পরে ঘরের বার হবি না? খোপায় একটা কাঠি গুঁজে দিয়েছিস তো? কোল আঁচলে গোরো দেয়া হয়েছে?”^৪

ঠাকুমা ছিলেন বুদ্ধিশূন্য মহিলা। কিন্তু ছড়া ও প্রবাদ ব্যবহারে তার জুড়ি মেলা ভার। সমকালীন সমাজে প্রবাদ ও ছড়ার প্রয়োগ যে কতখানি ছিল তা এই চরিত্রটির মধ্যে ধরা পড়ে। ঠাকুমা প্রত্যেক বাক্যের সাথে ছড়া প্রয়োগ করেছে। যা তার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বেতনভুক ভৃত্য তার আদেশ যখন এড়িয়ে চলেছে তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে বলেছেন –

“সময়ে ভেকের লাথিও হস্তিকে সহ্য করিতে হয়।”^৫

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের থেকে পুরুষের কদর যে অধিক ছিল সেই ছবিটিও লেখিকা তুলে ধরেছেন ঠাকুমার নাতনি অপেক্ষা নাতির প্রতি প্রকাশিত ভালোবাসার বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। আর তাই নাতনি অপেক্ষা বিনুকে সে আদর স্নেহ ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে। নিজের জীবনের শেষ সঞ্চয় স্বর্ণ মোহরগুলি তুলে দিয়েছেন বিনুর হাতে। যার সন্ধান বাড়ির অন্য কারোর কাছে ছিল না। লেখিকা তার মনোভাবের কথাটি ব্যক্ত করেছেন –

“ভাবলাম পরমাকে ধরে দেবো। কিন্তু আবার ভাবলাম পরমা আমার পেটের মেয়ে হলেও পরের বাড়ী গেছে। ভিন্ন গোত্র হয়েছে। আমার ঘরের লক্ষ্মী পরের ঘরে দিতে পারলাম না। তেমনি পড়ে রয়েছে। মেয়েগুলো টের পেলে এতদিন লুটের মাল করে নিতো। আমার লক্ষ্মী আমি তোকেই দিতে চায় মানিকমালা। তুই আমার লক্ষ্মী, রায়বাড়ীর লক্ষ্মী, আমার পেসাদের লক্ষ্মী।”^৬

লেখিকা দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিভূ রূপে উপস্থাপন করেছেন রায়বাড়ির পরবর্তী কত্রী অতিশয় আচার পরায়ণা মনোরমাকে। যার দেবতার প্রতি ভক্তি অপেক্ষা ভয় ছিল প্রবল, তাই সর্বদা আতঙ্কিত থাকত অনাচারের ভয়ে। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখিকা সমসাময়িক সমাজে নারীর বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামীর নিকট অসম্মান অবহেলা সহ্য করে সংসারে অব্যাহত হয়ে জীবন কাটানোর যে সংগ্রাম সেই পরিস্থিতির আভাস দিয়েছেন। একসময় জমিদার বাড়িতে সামান্য স্থানটুকু পেতে যাকে বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, রূপের কারণে স্বামী ও শাশুড়ির নানান গঞ্জনা অপমানকে সহ্য করতে হয়েছে, সময়ের সাথে তার স্থানের পরিবর্তন ঘটেছে। মর্যাদার বৃদ্ধি হয়েছে। তার আদেশ অন্দরমহলের সকলের শিরোধার্য। শিবসুন্দরী যে বধূকে মেনে নিতে পারেননি সেই বধূ হয়েছে সংসারের কত্রী। মহেশবাবুর তরুণ বয়সে নিজের স্ত্রীর প্রতি ছিল না কোন দ্রুক্ষেপ। মহেশের মধ্যে ‘যোগাযোগ’ উপন্যাসের মধুসূদনের চারিত্রিক মিল রয়েছে। নীলাম্বরী ঢাকাই আবদার করাতে স্বামীর কাছে মনোরমাকে শুনতে হয়েছিল -

“নীলাম্বরী তোমাকে মানাবে না। পরলে লোকে হাসবে।”^৭

তরুণ বয়সের সেই অপমান ভুলতে পারেননি তিনি। একজন নারীর হৃদয়ে স্বামীর সামান্য প্রশংসা যেমন আনন্দের উদ্বেক করে তেমনি অপমান তার সমস্ত সত্তার আনন্দকে ধূলিসাৎ করে। তাই মনোরমা সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে সন্তান এবং সংসারের যাবতীয় কাজকে আঁকড়ে ধরে জীবন কাটিয়েছেন। স্বভাবতই আচার সম্পর্কে হয়েছেন কঠিন। সামান্য আনাচারকেও মেনে নিতে পারেননি। তরুণ বয়সে স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা রূপের কারণে তাকে যে বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল পুত্রবধূর ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তিদেরই মতবদল দেখে তিনি স্তম্ভিত হয়েছেন এবং পুরনো অব্যাহত স্মৃতি উদয় হয়েছে। তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে নারী হৃদয়ের ঈর্ষা, তাই বধূর প্রতি কটুক্তির প্রকাশ ঘটেছে। পুত্রবধূ নির্বাচনে মহেশবাবু মনোরমার মতামতটুকু নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। সেই ক্ষোভ মনোরমার অন্তরে ছিল, কিন্তু বাংলাদেশের মেয়ে তাই তার বুক ফেটে গেলেও মুখ ফোটে নি। সমাজের চিরাচরিত নিয়মে বাধা পড়ে সংসার ও পরিবারের কল্যাণে নিজস্ব ভালোলাগা খারাপলাগা টুকুকে নস্যাৎ করে স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকা পালন করেছে।

মনোরমার পাশাপাশি আচার নিয়মনিষ্ঠার ঘেরাটোপে অকাল বৈধব্য জীবনকে পরিবেষ্টিত করে রাখা জমিদার কন্যা সরস্বতীকে দেখা যায়। যে ছিল জমিদার বাড়ির মেজমেয়ে। বৈধব্য পরবর্তী জীবনে শ্বশুরবাড়ির সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে বাবার বাড়িতে শুচিতাকে অবলম্বন করে দিন কাটিয়েছে। তার জীবনে একমাত্র আশ্রয় দেবতা ও তৎসম্পর্কিত নিয়মিষ্ঠা। মায়ের সাথে সরস্বতীই ছিল বাড়ির গৃহিনী আবার কখনো কখনো মায়ের উপরে। সরস্বতী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে লেখিকা বিধবার মানসিক চাহিদার কথা স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। পুজোয় স্বামীর আগমনের পত্র পেয়ে যখন তার দিদি বোনেরা উৎফুল্ল হয় তার মনে তখন হয় জ্বালার উদ্বেক। এমনকি রাতে তার দিদি বোন ও নতুন বধূ ঘুমানোর জন্য ব্যস্ত হলে সরস্বতী কিন্তু তাদেরকে নানান ভাবে কাজের নির্দেশ দিয়ে আটকে রাখতে চেয়েছে। লেখিকা তার মনের আভিসন্ধির কথা স্পষ্টভাবে উপন্যাসে বুঝিয়ে দিয়েছেন -

“বধূ ও বড় ভগিনী যে স্বামী সজ্জাভাগিনী হইবে ইহা তার অসহ্য। কাজের অজুহাতে বাকি রাতটুকু এইরূপে অতিবাহিত হইলেই তার শান্তি। সে যে সর্বহার্য বঞ্চিতা, সকলকে লইয়া কর্মজালে জড়াইয়া তাহার দুঃখের রজনী ভোর করিতে চায়।”^৮

তার চাওয়া পাওয়া পরিপূর্ণ না হওয়ায় তার বাণী হয়েছে কর্কশ। সামান্য পশু পক্ষীর প্রতিও তার ছিলনা সহানুভূতি। নিজের মানসিক অভৃষ্টির কারণে তার শিল্পকর্মকুশল নৈপুণ্যের দিকটিকে তিনি অনায়াসে অবহেলা করে, সমাজে আধিক মূল্য

পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় বেছে নিয়েছেন সংসারের গুরুদায়িত্ব। এয়েন সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই। সমকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সরস্বতী যেন বেশিই প্রাচীনপন্থী, কোন স্বাভাবিক ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা তার ছিল না, বিশেষত কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটলে তার আশ্বিনের ছিল না অন্ত। বাড়ির নতুন বধূর সমবয়সী দেবরের সাথে কথা বলা মেনে নিতে পারেনি সে, বিরক্ত হয়েছে। ভাই বোন হিসাবে তাদের ভাবতে পারেনি। লেখিকা এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে নারীর সামাজিক মর্যাদার দিকটি ঠিক কেমন ছিল এবং একজন নারীর পারিবারিক গুরুত্ব ঠিক কতখানি সেই বিষয়টিও কিছুটা স্পষ্ট করেছেন। যেহেতু বাড়ির সকল শুদ্ধাচারী নিয়ম নিষ্ঠামূলক কাজে ছিল সরস্বতীর বৃহৎ ভূমিকা তাই তার সকল কটু বাক্য সহ্য করেও কেউ করেনি কোন প্রতিবাদ। অর্থাৎ, কার্যক্ষমতা এবং দায়িত্ববোধ এসবের উপর নির্ভর করেছে একজন মানুষের গুরুত্ব।

এই উপন্যাসে গিরিবালা দেবী যেমন ঠাকুমা শিবসুন্দরীর মধ্যে দিয়ে রক্ষণশীল ধ্যানধারণাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি অন্যদিকে দাঁড় করিয়েছেন বিনুকে, যার জগতে পালাপার্বন, ব্রত-পুজো, আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি স্থান পেয়েছে ‘নৌকাডুবি’, ‘কড়ি ও কোমল’, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’। বিনুর ব্যক্তিত্বের বিকাশই ছিল ‘রায়বাড়ী’ উপন্যাসটির মূল উপজীব্য। তাই এই উপন্যাসটি দুটি খণ্ড জুড়ে কেবলই যে রায় পরিবারের কাহিনি রয়েছে তা নয়। বিনুর বাল্যকালের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখিকা তার পিতৃগৃহ, সেখানকার পরিবেশ ও তার মামার বাড়ির গ্রামটির কথা, সেখানকার মানুষদের কথা উপস্থাপন করেছেন। স্বাভাবিক ভাবেই নানান ঘটনার উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখিকা সামাজিক প্রেক্ষাপটটিকে অত্যন্ত নিপুণতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের সূচনায় বিনুকে রায়বাড়ির পুত্রবধূ রূপে দেখা যায় এবং সমগ্র উপন্যাস জুড়ে রায়বাড়ির প্রতিটি উৎসব ও ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কার, আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানা যায়। লেখিকা সমকালীন সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহের পরবর্তী সময়ে একটি ছোট্ট মেয়ের জীবনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজটাকে অঙ্কন করেছেন। বিনুর আড়ালে রয়েছে বাংলাদেশের মেয়েদের জীবনের কাহিনি। সামান্য সুজি চিনির বয়ানের পার্থক্য করতে অক্ষম হলেও শাশুড়ি ননদের কাছে যে কর্কশ বাণী শুনতে হয়েছে তার মধ্য দিয়ে সংসারে নববধূদের অবস্থানটি কেমন ছিল সেই বিষয়টি স্পষ্ট। লেখিকা সমাজের এক কঠিন সত্যকে তুলে ধরেছেন –

“আমাদের দেশের এক আশ্চর্য ব্যাপার, বৌ আসে ফাঁসির আসামি হয়ে। যে শাশুড়ি বধূ-অবস্থায় যত কষ্ট পায়, তার পুত্রবধূ এলে সেই কষ্ট তাকে না দিয়ে তৃপ্ত হয় না।”^{১০}

সামান্য পুকুরে স্নান করাকে ঘিরেও যে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে বিশেষত পুকুরে সাঁতার কাটার কারণে রায়বাড়ির অন্দরমহলে যে ঝড় উঠেছিল তা থেকে খুব স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় সেই সময় বাড়ির মেয়ে এবং বউদের কতখানি বন্ধনে বন্দি করে রাখা হত। উনিশ শতকে নারী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটেছিল ঠিকই, কিন্তু সেই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ার সুযোগ পায়নি সবাই। কারণ সমাজে ধারণা ছিল নারী শিক্ষিত হলে বৈধব্য অবশ্যম্ভাবী। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বহু রক্ষণশীল পরিবার তাদের মেয়েদের শিক্ষা থেকে রেখেছিল বঞ্চিত। এ উপন্যাসে বিনুও প্রথাগতভাবে শিক্ষিত হয়নি তবে বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামীর সাহায্যে ধীরে ধীরে তার শিক্ষার জগতে প্রবেশ ঘটে। একে একে বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত, ইংরেজি শিক্ষার প্রতিও তার আগ্রহ তৈরি হয়। যোগাযোগ হয় আধুনিক সাহিত্যের সাথে। শিক্ষার সংস্পর্শে তার মন মানসিকতার পরিবর্তন হয়। জগৎজীবন সম্পর্কে জ্ঞানের আলোকে উদ্দীপ্ত হয়। শিক্ষা বালিকা বিনুকে ধীরে ধীরে পরিণত করে তুলেছে। তাই সে সমাজের কুসংস্কার গুলোকে তুচ্ছ করতে শেখে। যা অন্যায় তার বিরুদ্ধে সদর্পে গর্জে উঠতে দেখা যায়। মামার বাড়ির গ্রামে জমিদারের প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় বিয়ে করার কথা জানতে পারায় সেই ঘটনা মেনে নিতে পারেনি –

“বিনু সহসা জুলিয়া উঠিল, একটা পুরুষের দুই তিনটে বৌ শুনলে আমার ঘেন্না করে। মেয়েদের যেমন এক স্বামী, পুরুষের তেমনই এক বৌ থাকবে। মানুষের যদি চরিত্রই না থাকে তাহলে থাকলো কি?”^{১১}

বিশ শতকে মানুষ অনেকটাই সভ্য হয়েছে সংযত হয়েছে কিন্তু তখনও পুরোপুরিভাবে বহুবিবাহের প্রচলন থেমে যায়নি, এই ঘটনাটি উত্থাপনের মাধ্যমে লেখিকা সেই প্রেক্ষাপটটি বুঝিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি লেখিকা প্রতিবেশী ব্যবসায়ী মথুর দত্তের দ্বিতীয় স্ত্রী ললিতার কথা তুলে ধরেছেন। ললিতা গরিবের মেয়ে। তাই তার বাবা মা অর্থের প্রাচুর্যের কারণে এক স্ত্রী বর্তমান দ্বিগুণ বয়সের পাত্রের সাথে তার বিবাহ দিয়েছে। সেই বিবাহের পরিণতি হয়েছে অত্যন্ত করুণ। ললিতা শেষ পর্যন্ত যাত্রার দলের সাথে পলায়ন করেছে। লেখিকা ওরফে বিনু এই ঘটনাটিকে সমর্থন করেছে। ললিতার যন্ত্রণাময় জীবনের প্রতি সে ছিল সহানুভূতিশীল। বিভিন্ন সাহিত্যের সংস্পর্শে বিনুর চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটেছে। তাই চিরাচরিত প্রচলিত কুপ্রথার বিরুদ্ধাচারণ করেছে।

বিনুর মধ্যে লেখিকা স্বামীর অনুপ্রেরণায় স্বদেশ ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সেই সময় দেশভাগের প্রতিবাদের ঝড়ের প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে রয়েছে। মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে গান বেঁধেছেন –

“না জাগিলে সব ভারত ললনা?
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।”^{১১}

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাজারে সমস্ত বিলেতি কাপড় কিনে নিয়ে জমিদার পুড়িয়ে দিয়েছেন পাড়ায় পাড়ায়। বন্ধুমহলে বিলেতি বর্জনের বক্তৃতা দিয়েছেন এবং সেই দলে প্রসাদকেও যোগ দিতে দেখা যায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বিনুর মধ্যেও সেই ভাবনার সঞ্চারন ঘটেছে। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের বিমলার সাথে বিনুর সাদৃশ্য দেখা যায়। যশোধরা বাগচী ‘রায়বাড়ি’ উপন্যাসের ভূমিকা অংশে বলেছেন –

“কিছুটা সনাতন ঐতিহ্যবাহী, কিছুটা ইংরেজি ভিক্টোরীয় গার্হস্থ্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত স্বদেশী যুগের ভদ্রলোকের উপযুক্ত সঙ্গিনী রূপে বিনুকে প্রস্তুত হতে হয়।”^{১২}

স্বামীর আনুপ্রেরণা ও বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসের স্বদেশ ভাবনা বিনুকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

গিরিবালা দেবী তাঁর স্মৃতিকথামূলক উপন্যাসটিতে তিনটি প্রজন্মের কাহিনি একত্রিত করে গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন। তিনটি প্রজন্মের প্রতিভূ রূপে উপস্থাপিত করেছেন রায়বাড়ির তিনজন কত্রীকে। পাশাপাশি উপস্থিত করেছেন চঞ্চল বালিকা তরুকে, বাড়ির মেজো মেয়ে বাল্যবিধবা সরস্বতীকে ও ছোট ঠাকুমাকে। সরস্বতীর মতো ছোট ঠাকুমাও ছিলেন অতিশয় আচার পরায়ণা। লেখিকা ছোট ঠাকুমা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে রায়বাড়ির অন্দরমহলের গোপন সত্যের আভাস দিয়েছেন। শিবসুন্দরীর কাছ থেকেই বিনু জানতে পেরেছে ভোর না হতে পূজোর ফুল নেওয়ার ছুতোয় কর্তার সাথে শলা পরামর্শের জন্য আসত ছোট ঠাকুমা। তাই ছোট ঠাকুমার গুণের বর্ণনা করতে গিয়ে শিব সুন্দরীর শ্লেষ মিশ্রিত তির্যক উক্তি রয়েছে-

“ওর যে কত গুণ তা তো তুই জানিস নে, জানবি ক্যামনে নতুন বৌ?”^{১৩}

মেয়েদের বিচিত্র চরিত্র ও তাদের বিচিত্র সমস্যা এবং তারই অনুষঙ্গে উল্লেখিত সামাজিক নানা অবিচার ও দুর্নীতির প্রতি ছিল লেখিকার কটাক্ষ।

এই উপন্যাসটিকে বাঙালি মেয়েদের লোকজীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় আকরগ্রন্থ বলা যায়। এই উপন্যাসে আদ্যোপান্ত মেয়েলি জীবনের অন্তঃপুরের কথায় ব্যক্ত। যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে গিরিবালা দেবী লিখেছেন তা কোন পুরুষ লেখকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে লেখিকা উপন্যাসটির মধ্যে একটি বিষয় খুবই নির্দিষ্ট ভাবে দেখিয়েছেন রায়বাড়ির অন্দরমহল মেয়েদের নিজস্ব জায়গা হলেও সেখানে ক্ষমতার নাড়া বাঁধা থাকে পুরুষের কর্তৃত্বের সঙ্গে। প্রসাদের জন্যই বিনুর জীবনের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। সে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছে। পরবর্তী কালে স্বামী জমিদারি ছেড়ে কর্মজীবন বেছে নিয়ে কলকাতায় এসে বসবাস করলে তিনিও তার সঙ্গে এসেছেন। জমিদারি কোন মোহ তাদের বেঁধে রাখতে পারেনি। এর মূলে ছিল প্রকৃত শিক্ষা। অন্যদিকে জমিদার মহেশবাবু তরুণ বয়সে স্ত্রীর প্রতি অযত্ন করলেও অন্তঃপুরের নারীদের কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে তিনি ছিলেন তৎপর। এছাড়া ক্ষিতি অর্থাৎ ক্ষিতিশচন্দ্র রায় এবং সুমন্ত বা সুমু অর্থাৎ সুরেশচন্দ্র রায় এদের উপস্থিতিতে পরিবারের কাঠামো কেমন ছিল সে বিষয়টি লেখিকা ভীষণ

নিখুঁতভাবে পরিবেশন করেছেন। ছোট বালিকা তরুর মধ্য দিয়ে জমিদার বাড়ির মেয়েদের জীবনের চিত্র এঁকেছেন। সাধারণ গৃহস্থ মেয়ে লবঙ্গের সাথে তুলনার মধ্য দিয়ে তাদের পরিবারের নিয়মকানুন বিধিনিষেধের পার্থক্য কতটা তার সুস্পষ্ট আলোচনা রয়েছে। প্রতিটি চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে লেখিকা ব্রিটিশ শাসনের সময় বাঙালির একান্ত নিজস্বতার প্রতীক যে সাবেকি বনেদি একান্নবর্তী পরিবার সেটি ভেঙে পড়ার মুখে তার এক নিখুঁত চিত্র এঁকে গেছেন এই উপন্যাসে। পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজ, সংস্কার, আচার-আচরণকে তুলে ধরেছেন। সেই সময় অতিথিদের আপ্যায়নের রীতি কেমন ছিল, তাদের কোন খাওয়ার পরিবেশন করা হত, সেকালে গৃহস্থ বাড়ির পরিচারিকা ও পরিচারকদের অবস্থা কেমন ছিল? আদৌ তাদের বেতন ছিল কিনা? অভিজাত ঘরের গৃহিণীরা অবসর সময় কীভাবে কাটাতেন, বাড়ির মেয়ে ও বধূর মধ্যে আচরণের ক্ষেত্রে নিয়মের কি পার্থক্য ছিল? সমাজে স্বামীর দ্বারা স্ত্রীদের প্রতারণার আশঙ্কা কী ছিল? নারী বহির্জগতে বিচরণ করতে না পারায় কেবলই অন্তঃপুরের রন্ধনশালা কে আঁকড়ে ধরেই কী বেঁচে ছিলেন, তাহলে তাদের জীবনচর্চা কেমন ছিল? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে এই উপন্যাসে।

গিরিবালা দেবী সেকালের স্বশিক্ষিত অন্তঃপুরবাসিনী একজন লেখিকা হয়ে বাড়ির সীমিত গণ্ডির বাইরে না গিয়ে, বহির্জগতে বিচরণ না করেও এত নিখুঁত সুন্দর ভাবে নিজের সময় ও যুগ ধর্মকে এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন যা আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। বস্তুত ‘রায়বাড়ী’ উপন্যাসটি লেখিকার অত্যন্ত পরিণত মন মানসিকতা, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। চরিত্র চিত্রনের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্যবোধ ও অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন লেখিকা। এ উপন্যাসের বাচনভঙ্গি ও রচনাশৈলী অত্যন্ত সাবলীল। অত্যন্ত নিপুন শিল্পীর দক্ষতায় তিনি একের পর এক চরিত্রকে ঘিরে কাহিনি সাজিয়েছেন। গ্রাম বাংলার মেয়েদের এইরূপ জীবন্ত বর্ণনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিরল। লোক প্রবাদ ও ছড়া এই রচনাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন –

“বর্তমান উপন্যাস খানি একাধারে উপন্যাস এবং সমাজ-তত্ত্ব ও লোকসাহিত্যের আকর গ্রন্থ। তারপরও ইহা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল।”^{১৪}

লেখিকা একটি যুগের বাঙালির সমাজে তার পারিবারিক জীবনের প্রতিফলনকে অত্যন্ত স্বচ্ছ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের ভঙ্গুর সমাজ ব্যবস্থা ও ভগ্ন জীবন বোধের মধ্যে ক্ষণিক শান্তির নিঃশ্বাস আছে এই উপন্যাসে। বিপুল আয়তনের রায়বাড়ির মতোই ‘রায়বাড়ী’ উপন্যাসেরও বিপুল ব্যাপ্তি।

Reference:

১. বসু, শর্মিলা, গিরিবালা দেবী: রায়বাড়ীর লেখিকা, *বিভাব* ২৫, ১৩৯১, পৃ. ৯২
২. সিংহ, মঞ্জুশ্রী, *গিরিবালা দেবী*, বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থা, ১৯৮৯, পৃ. ৩০
৩. দেবী, গিরিবালা, *রায়বাড়ী*, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থবিকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৯
৪. রায়, বাণী, (সম্পা.), *গিরিবালা দেবীর রচনাবলী*, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৩৮৪, পৃ. ১৯৩
৫. দেবী, গিরিবালা, *রায়বাড়ী*, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থবিকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৬২
৬. তদেব, পৃ. ৩০৫
৭. তদেব, পৃ. ১১৫
৮. তদেব, পৃ. ১২৩
৯. তদেব, পৃ. ৮৭
১০. তদেব, পৃ. ২৮১
১১. তদেব, পৃ. ২৬৭
১২. রায়চৌধুরী, সুবীর, (সম্পা.), *রায়বাড়ী*, দেজ পাবলিশিং, ২০১৪, পৃ. ১৩
১৩. দেবী, গিরিবালা, *রায়বাড়ী*, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থবিকাশ, ১৯৭৪, পৃ. ৪০
১৪. তদেব, পৃ. ৬